অধ্যায় - ৩৯

বাবার গীতা-শ্লোক ব্যাখ্যা, সমাধি মন্দির নির্মাণ।

এই অধ্যায়তে বাবা গীতার একটা শ্লোকের অর্থ বুঝিয়েছেন। কিছু লোকেদের এই ধারণা ছিল যে বাবা সংস্কৃত ভাষা জানতেন না এবং নানাসাহেবও তাই ভাবতেন। হেমাডপন্ত মূল মারাঠী গ্রন্থের অধ্যায় ৫০ তে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছেন। অধ্যায় ৩৯ ও ৫০ এর বিষয়বস্তু একরকম হওয়ার দরুণ এখানে সে দুটি সম্মিলিত ভাবে দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবনা ঃ-

শিরড়ীর সৌভাগ্যের বর্ণনা কে করতে পারে? দ্বারকামাঈও ধন্য যেখানে শ্রীসাই এসে থাকেন এবং সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

শিরডীর স্ত্রী পুরুষও ধন্য, যাদের অনুগৃহীত করে সাই এতদূর তাদের গ্রামে এসে সেখানে বসবাস করেন। শিরডী আগে একটা ছোট্ট গ্রাম ছিল। কিন্তু শ্রী সাইয়ের সংস্পর্শে এসে তার গুরুত্ব গেল বেড়ে এবং সেটি তীর্থস্থলে পরিণত হল।

শিরড়ীর মেয়েরাও পরম ভাগ্যবতী। বাবার প্রতি ওদের অসীম ও অচল ভক্তি-প্রেম প্রশংসার অতীত। সারাদিন ঘরে-বাইরের কাজকর্ম করতে- করতে ওরা বাবার কীর্তির গুণগান করত। ওদের ভালবাসার উপমাই বা কি হতে পারে? কি মধুরই না ছিল সেই নামগান যা গায়ক ও শ্রোতাদের মনে নিবিড় শান্তি এনে দিত।

বাবার দ্বারা টীকা ঃ-

কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে বাবা সংস্কৃতও জানেন। একদিন নানাসাহেব চাঁদোরকরকে গীতার একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়ে তিনি লোকেদের হতভম্ব করে দেন। এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রী বি. ভি. দেব মারাঠী সাই লীলা পত্রিকা ৪ তে ছাপান। অন্যটি Sai Baba`s Charters and Sayings পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠে ও The Wonderous Saint Sai Baba পুস্তকের পৃষ্ঠা ৩৬ তে দেওয়া আছে।

এই দুটি পুস্তকই শ্রী বি. ভি. নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত। শ্রী বি. ভি. দেব ইংরাজী তারিখ ২৭-৯-১৯১৬ একটা বক্তব্য দেন যেটি শ্রী নরসিংহ স্বামী দ্বারা রচিত পুস্তক 'ভক্তো কে অনুভব' (ভক্তদের অভিজ্ঞতা) এ ছাপা হয়। শ্রী দেব এই বিষয়ে প্রথম বিবরণ নানাসাহেব চাঁদোরকরের কাছে পান। তাই তাঁর কথা নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে-

নানাসাহেব চাঁদোরকর বেদান্তের ভালো ছাত্র এবং অনুরাগী ছিলেন। তিনি টীকা সহিত গীতার অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে খানিকটা অহংকারও ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে বাবার সংস্কৃতের বা এ ধরনের শাস্ত্রের জ্ঞান নেই। বাবা তাঁর এই ভ্রম দূর করবেন বলে স্থির করেন। এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন অল্পসংখ্যক ভক্তরা শিরডী আসত। নানাসাহেব এই সময় বাবার চরণ সেবা করছিলেন এবং অস্পষ্ট শব্দে কিছু গুন গুন করছিলেন।

বাবা - নানা, তুমি ধীরে-ধীরে কি বলছ?

নানা - আমি গীতার একটি শ্লোক পাঠ করছি।

বাবা - কোন্ শ্লোকটা?

নানা - ভগবদ্গীতার একটা শ্লোক।

বাবা - একটু জোরে বলো।

তখন নানা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪ তম শ্লোক পড়তে শুরু করেন-

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।।

বাবা - তুমি এর অর্থ জানো?

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবা।

বাবা - তবে বলো তো।

নানা - এর অর্থ এই যে - তত্ত্বকে যাঁরা জানেন, সেই জ্ঞানী পুরুষদের প্রণাম করে তাঁদের সেবা করো ও নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন করে সেই 'জ্ঞান' অর্জন করো। তখন সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।

বাবা - নানা, আমি এই ধরনের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ চাই না। আমায় প্রত্যেক শব্দের তার ভাষান্তরিত উচ্চারণের সঙ্গে ব্যাকরণসম্মত অর্থ বোঝাও।

এবার নানা এক-একটি শব্দের অর্থ বোঝাতে শুরু করেন।

বাবা - নানা, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাটাই কি যথেষ্ট?

নানা - 'নমস্কার করা' ছাড়া আমি 'প্রণিপাত' শব্দের অন্য কোন অর্থ জানি না।

বাবা - 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের অর্থ কী?

নানা - ঐ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।

বাবা - যদি 'পরিপ্রশ্ন' এবং 'প্রশ্ন'-র অর্থ একই তাহলে ব্যাস 'পরি' উপসর্গ ব্যবহার করেন কেন? তাঁর কি মাথা খারাপ হয়েছিল?

নানা - আমি ত 'পরিপ্রশ্ন' শব্দের আর কোন অর্থ জানি না।

বাবা - সেবা? এখানে কোন ধরনের সেবার কথা ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

নানা - এই- যে ধরনের সেবা আমরা আপনার করি।

বাবা - এই সেবা কি যথেষ্ট?

নানা - এ ছাড়া 'সেবা' শব্দের কোন বিশিষ্ট অর্থ আমার জানা নেই।

বাবা - পরের লাইনে 'উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানম্', জ্ঞানম্ শব্দের জায়গায় তুমি অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে অর্থ বলতে পারো।

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা - কি শব্দ?

নানা - অজ্ঞানম্।

বাবা - 'জ্ঞানম্'-য়ের এর পরিবর্ত্তে 'অজ্ঞানম্' বসালে কি এই শ্লোকের কোন অর্থ বেরোয়?

নানা - আজ্ঞে না, শঙ্কর ভাষ্যে এই ধরনের কোন ব্যাখ্যা নেই।

বাবা - নেই ত কি হলো? যদি 'অজ্ঞানম্' শব্দটি ব্যবহার করে যদি অর্থ আরো পরিষ্কার হয় তাহলে তাতে আপত্তিটা কি?

নানা - 'অজ্ঞানম্' শব্দটি বসিয়ে এর কি ভাবে অর্থ করা যায় আমি বুঝতে পারছি না।

বাবা - কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শীদের প্রণাম করে তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ও সেবা করতে উপদেশ দেন কেন? কৃষ্ণ স্বয়ং কি তত্ত্বদর্শী নন? বস্তুতঃ স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ!

নানা - আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি জ্ঞানাবতার ছিলেন। কিন্তু আমিও বুঝতে পারছি না যে কেন তিনি অর্জুনকে অন্য জ্ঞানীদের কাছে যেতে বললেন।

বাবা - তুমি কি সত্যি বুঝতে পারছ না?

এবার নানাসাহেব হতভম্ব হয়ে যান। ওঁর দর্প চূর্ণ হয়। তখন বাবা স্বয়ং এই ভাবে তার অর্থ বোঝাতে শুরু করেন -

১) জ্ঞানীদের শুধু সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেই চলে না। সদগুরুর প্রতি সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে হবে।

২) কেবল প্রশ্ন করাই যথেষ্ট নয়। কোন কু-প্রবৃত্তি বা বাক্য-জালে ফাঁসাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন করা বা গুরুর ভুল ধরার প্রবৃত্তি নিয়ে বা ভণ্ডামি করে প্রশ্ন করা উচিত নয়। বরং যথোচিত মর্যাদা সহকারে, কেবল মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করার উদ্দেশ্যেই প্রশ্ন করা উচিত।

৩) "আমি সেবা করার বা না করার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র - করতেও পারি আর নাও করতে পারি"- যে এই ধরনের মনোভাব নিয়ে সেবা করে তার সেবাকে সেবা বলা যায় না। তার বোঝা উচিত যে নিজের দেহের উপর তার কোন অধিকার নেই। এই শরীরের উপর গুরুরই অধিকার এবং শুধু তাঁর কথামত চলে তাঁরই সেবার নিমিত্তেই সেটি বিদ্যমান রয়েছে। এইরূপ আচরণে সদগুরু তোমায় সেই 'জ্ঞান' (যার কথা ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে) কি বস্তু তা দেখিয়ে দেবেন।

নানা বুঝতে পারেন না যে গুরু কিভাবে অজ্ঞানের শিক্ষা দেন।

বাবা - জ্ঞানের উপদেশ কাকে বলে? অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে আত্মানুভূতি লাভ হবে

তার শিক্ষা। অজ্ঞানের নাশ হওয়াই জ্ঞান।

(গীতার শ্লোক ১৮-৬৬ তেই জ্ঞানেশ্বরী ভাষ্যে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - "হে অর্জুন, তোমার ঘুম ও স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে তুমি নিজ স্বরূপ হও।" এই রকমই গীতার ৫-১৬ অধ্যায়ের টীকাতে লেখা আছে - জ্ঞানের তাৎপর্য্য অজ্ঞান দূর করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

অন্ধকার নষ্ট হওয়ার অর্থই প্রকাশ। দ্বৈত ভাব দূর করার আলোচনার মানে হল অদ্বৈতের কথা বলা। যখন অন্ধকার দুর করার কথা বলা হয় তখন তার অর্থ হচ্ছে যে আমরা আলোর কথা বলছি। অদ্বৈতের অবস্থা উপলব্ধি করতে গেলে সর্বাগ্রে দ্বৈতের ভাব দূর করতে হবে। এটাই অদ্বৈত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ। দ্বৈত অবস্থায় থেকে অদ্বৈতের আলোচনা কে করতে পারে? যতক্ষণ সেরকম অবস্থা প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ কি কেউ সেটা অনুভব করতে পারে? শিষ্য সদগুরুর মতই জ্ঞান-মূর্তি। তাঁদের দুজনের মধ্যে শুধু অবস্থা, উচ্চ অনুভূতি, অদ্ভুত অলৌকিক সত্য, অদ্বিতীয় যোগ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে। সদগুরু নির্গুন নিরাকার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আসলে তিনি বিশ্ব ও মানব কল্যাণ হেতুই স্বেচ্ছায় মানব শরীর ধারণ করেন। কিন্তু নরদেহ ধারণ করা সত্ত্বেও তাঁর অস্তিত্ব সীমাহীন। তাঁর আত্মোপলব্ধি, দৈবিক শক্তি ও জ্ঞান সর্বদা এক রকমই থাকে। আসলে শিষ্যেরও ঐ একই স্বরূপ। কিন্তু অসংখ্য জন্মের সংস্কারের ফলে অবিদ্যার আবরণ তাকে ঢেকে রাখে। তাই ওর ভ্রম হয় এবং নিজের শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ বিস্মৃত হয়। গীতার অধ্যায় ৫এ দেখো - "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্ত জন্তবঃ।" ওর এটা একটা ভ্রম মাত্র- "আমি জীব, একটি প্রাণী, দূর্বল ও অসহায়।" এই অজ্ঞানরূপী জড়কে কেটে ফেলার জন্য গুরুকে উপদেশ দিতে হয়। এই ধরনের শিষ্যকে যে জন্ম জন্মান্তর থেকে এই ধারনা করে বসে আছে যে, "আমি ত জীব, দূর্বল এবং অসহায়", গুরু সহস্র জন্ম ধরে শিখিয়ে যাচ্ছেন- "তুমিই ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান এবং সর্বসমর্থ।" তবে গিয়ে তার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস হয় যে- "যথার্থে আমি ঈশ্বর।" সর্বদা মোহগ্রস্থ হয়ে থাকার দরুণ ওর এইরূপ মনে হয়- "আমি শরীর, একটি জীব এবং ঈশ্বর ও এই বিশ্ব আমার থেকে ভিন্ন বস্তু।" কর্মানুসারে প্রত্যেক প্রাণী সুখ-দুঃখ ভোগ করে। এই মোহ, এই ভ্রান্তি এবং এই অজ্ঞতার জড় নষ্ট করার জন্য আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে এই অজ্ঞতা কোথায় এবং কি করে জন্মাল? শিষ্যের এই অনুসন্ধানের দিগদর্শন করানোকেই উপদেশ বলা হয়।

অজ্ঞানের উদাহরণ ঃ-

১) আমি একটি জীব।

২) শরীরই আত্মা। (আমি আত্মা)

৩) ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব পৃথক তত্ত্ব।

৪) আমি ঈশ্বর নই।

৫) শরীর আত্মা নয়- এর বোধ না হওয়া।

৬) এর জ্ঞান না থাকা যে ঈশ্বর, বিশ্ব এবং জীব এক ও অভিন্ন।

যতক্ষন শিষ্যের সামনে এই ভুলগুলি তুলে না ধরা হয় ততক্ষন সে এটা অনুভবই করতে পারে না যে ঈশ্বর, জীব এবং শরীর কি; তাদের মধ্যে পারস্পরিক কি সম্বন্ধ এবং ওরা পরস্পর ভিন্ন না অভিন্ন? এই ধরনের শিক্ষা দেওয়া ও ভ্রম দূর করাকেই 'অজ্ঞান' এর জ্ঞানোপদেশ বলা হয়। এবার প্রশ্ন এই যে- "জীব- যে নিজেই জ্ঞান-মূর্তি, তার জ্ঞানের কি দরকার?" উপদেশের তাৎপর্য্য তো শুধু ত্রুটিগুলি তার সামনে তুলে ধরে তার অজ্ঞান দূর করা। বাবা এও বলেন -

১) 'প্রণিপাত' এর অর্থ 'শরণাগতি'।

২) দেহ, মন ও অর্থ - সব কিছু সমর্পণ করা উচিত।

৩) কৃষ্ণ অন্য জ্ঞানীদের দিকে কেন সংকেত করেন? সদভক্তের জন্য তো প্রত্যেক তত্ত্বই বাসুদেব (ভগবৎ গীতা অধ্যায় ৭-১৯। অর্থাৎ যে কোন গুরুই শিষ্যর জন্য কৃষ্ণ)। গুরুও শিষ্যকে বাসুদেব বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এঁদের দুজনকে নিজের প্রাণ ও আত্মা। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে এমন অনেক ভক্ত ও গুরু বিদ্যমান আছেন। তাই তাদের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলেন।

সমাধি মন্দিরের নির্মাণ ঃ-

বাবা যা করতে চাইতেন সে বিষয়ে আলোচনা বা হৈ-চৈ করতেন না। পারিপার্শিক অবস্থা এমন করে দিতেন যে লোকেদের তার মন্থর অথচ নিশ্চিত পরিণাম দেখে বড়ই আশ্চর্য্য লাগত। সমাধি মন্দির এই কথারই উদাহরণ। নাগপুরের প্রসিদ্ধ লক্ষপতি শ্রীমান বাপুসাহেব বুটী সপরিবারে শিরডীতে থাকতেন। একবার ওঁর মনে হয় যে

শিরডীতে ওঁর নিজস্ব একটা বাসস্থান (বাড়ী) থাকা উচিত। কিছু দিন পর দীক্ষিত 'ওয়াড়া'য় ঘুমিয়ে থাকার সময় তিনি একটা স্বপ্ন দেখেন- বাবা বলছেন- "তুমি নিজের একটা 'ওয়াড়া' ও একটা মন্দির তৈরী করাও।" শামাও সেখানে শুয়েছিলেন এবং উনিও ঠিক এই একই স্বপ্ন দেখেন। বাপুসাহেব ঘুম থেকে ওঠে দেখেন শামা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় শামা বলেন- "এক্ষুনি আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে বাবা একেবারে আমার কাছে এসে স্পষ্ট শব্দে বললেন যে মন্দিরের সাথে 'ওয়াড়া' বানাও। আমি সব ভক্তদের ইচ্ছে পূরণ করব। বাবার মধুর ও প্রেমপূর্ণ শব্দ শুনে আমারও প্রেম উপছে পড়ে এবং গলা রুদ্ধ হয়ে চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বইতে লাগল।" তাই আমি জোরে-জোরে কাঁদছিলাম। বাপুসাহেব বুটী খুবই অবাক হন যে দুজনেরই স্বপ্ন এক রকম কি করে হতে পারে? অর্থশালী তো তিনি ছিলেনই। তাই একটা 'ওয়াড়া' নির্মাণ করাবেন স্থির করেন। শামার সাথে বসে একটা নক্সা আঁকেন। কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেটা অনুমোদন করেন। এবার সেই নক্সা বাবার সামনে রাখা হয়। তিনিও ততক্ষণাৎ স্বীকৃতি দিয়ে দেন। তখন নির্মাণকার্য্য শুরু করে দেওয়া হয় এবং শামার তত্ত্বাবধানে প্রথম তলা, মাটির নীচের ঘর ও কুয়ো তৈরী হয়ে যায়। বাবা লেন্ডীবাগ যেতে আসতে কখনো-কখনো কিছু পরামর্শ দিতেন। এরপর এই কাজটি বাপুসাহেব যোগকে দেওয়া হয়। যখন এই ভাবে কাজ এগোচ্ছিল সেই সময় একদিন বাপুসাহেবের খেয়াল হয় যে একটু খোলা জায়গাও অবশ্যই রাখা উচিত এবং তার ঠিক মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপনা করলে ভালো হয়। তিনি নিজের এই প্রস্তাবটি শামাকে জানান এবং বাবার কাছে অনুমতি নিতে অনুরোধ করেন। বাবা সে সময় 'ওয়াড়া'র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন শামা তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চান। শামার কথা শুনে বাবা স্বীকৃতি দিয়ে বলেন- "যখন মন্দিরের কাজ পুরো হয়ে যাবে তখন আমি স্বয়ং সেখানে থাকব।" ওয়াড়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওয়াড়া তৈরী হয়ে গেলে আমরা সবাই সেটা উপভোগ করব। ওখানেই থাকব, ঘুরব-ফিরব এবং পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে আনন্দ সহকারে দিন কাটাব।" তখন শামা জিজ্ঞাসা করেন- "এই মুহূর্তটি মূর্তিকক্ষের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য কি শুভ?" বাবা স্বীকৃতিসূচক উত্তর দেওয়ায় শামা একটা নারকেল এনে ভাঙ্গেন এবং কাজ শুরু করে দেওয়া হয়। ঠিক সময় সব কাজ পুরো হয়ে যায় এবং শ্রীকৃষ্ণের একটা সুন্দর মূর্তি তৈরী করাবার ব্যবস্থা করা হয়। তখনও মূর্তির কাজ শুরুও হয়নি, একটা নতুন ঘটনা সবাইকে ব্যস্ত করে তোলে। বাবার স্বাস্থ্য চিন্তাজনক হয়ে দাঁড়ায় এবং মনে হল বাবা দেহরক্ষা করবেন। বাপুসাহেব খুবই হতাশ ও উদাস হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবেন- "বাবা চলে গেলে 'ওয়াড়া' তাঁর পবিত্র চরণের

স্পর্শ হতে বঞ্চিত থেকে যাবে এবং আমার সব অর্থব্যয় (প্রায় এক লক্ষ টাকা) ব্যর্থ হয়ে যাবে।" কিন্তু শেষ সময় বাবার ইচ্ছে ("আমায় ওয়াড়াতেই রেখো") শুধু বুটী সাহেবকেই নয় বরং প্রতিটি মানুষকে সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করে। বাবার পবিত্র শরীর শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির জায়গায় স্থাপিত হলো। বাবা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হলেন এবং 'ওয়াড়া' সাইবাবার সমাধি মন্দির।

তাঁর অনন্ত লীলার কোন সীমা কেউ পায়নি। শ্রী বাপুসাহেব বুটী ধন্য, যাঁর 'ওয়াড়া'-য় বাবার দিব্য এবং পবিত্র পার্থিব শরীর বিশ্রাম করছে।

।। শ্রী সাইনাথোর্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।